Vol. 2 | No. 2 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য

Volume	2
Issue	2
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	December 16, 1958
DOI	10.62328/sp.v2i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i2.3
Pages	89-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য

Check for updates

আনিসুজ্জামান

নবাবী আমলের বাংলা দেশে ফারসী (ও পরে উর্দু) ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রভাবে বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। নগরে ও বন্দরে এই মিশ্রণ ঘটেছিল সবচেয়ে বেশী আর এইসব নগর-বন্দরের অল্পশিক্ষিত কবিদের হাতে কোম্পানী আমলের শুরুতে বিদেশী শব্দবহুল ভাষায় কাব্যরচনার একটা রীতি গড়ে ওঠে, যাকে আমরা মিশ্র ভাষারীতি আখ্যা দিতে পারি। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এঁরা তাই অবলম্বন করেছিলেন, কোন কোন লেখক যাকে matter of Perso-Arabic world বলে অভিহিত করেছেন।[১] এই বিষয়বস্তু অবশ্য অনুকৃত হয়েছিল শাহ্ মুহম্মদ সগীর (পঞ্চদশ শতাব্দী) থেকে শুরু করে হায়াৎ মামুদের (অষ্টাদশ শতাব্দী) রচনায়—রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ছদ্ম-ঐতিহাসিক যুদ্ধকাহিনী, পীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী বা শাস্ত্রকথার অনুবাদ-অনুসরণে। তবে নবাবী আমলের শেষে ও কোম্পানী আমলের প্রথমে মিশ্র ভাষারীতির কবিদের হাতে এই বিষয়বস্তু প্রধান ও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ভাষাগত দিক দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, কৃষ্ণরাম দাসের (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ) 'রায়মঙ্গলে'[২] অথবা রামাই পণ্ডিতের লেখা বলে কথিত 'শূন্যপুরাণে'[৩] বিদেশী শব্দবহুল ভাষার ব্যবহার দেখা যায়ঃ তবে সমগ্র কাব্যে এই ভাষা ব্যবহারের প্রথম কৃতিত্ব হুগলীর বালিয়া-হাফেজপুর নিবাসী ফকির গরীবুল্লাহ্‌র (আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ) প্রাপ্য।[৪]

১। গোপাল হালদার: বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭২।

২। ব্যোমকেশ মুস্তফী: রায়মঙ্গল দ্রঃ। সা-প-প, ১৩০৩।

৩। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৯৯-৫০০ দ্রঃ।

৪। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের উদ্ভব ও গরীবুল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি। 'সায়ের' ফকির গরীবুল্লাহ্: সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৫ দ্রষ্টব্য।

মিশ্র ভাষারীতির কাব্যপ্রসঙ্গে গরীবুল্লাহ্‌র পর আমরা যাঁর নাম করতে পারি, তিনি সৈয়দ হামজা। কেবল কালের দিক দিয়ে নয়, রচনাশৈলীর উৎকর্ষের দিক দিয়েও বটে। "রচনাপ্রাচুর্য্যে সৈয়দ হামজা ইসলামি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি"[১]—এ মন্তব্য হয়তো যথার্থ নয়ঃ কারণ, হামজার গ্রন্থ-সংখ্যা চারের বেশী নয়; অন্তত ঐ সংখ্যক বই মোহাম্মদ দানেশও লিখেছিলেন; শাহ গরীবুল্লাহ্‌ পাঁচখানা বই লিখেছিলেন বলে অনুমান করি; মোহাম্মদ খাতেরের বই পাই আটখানা; আবদুর রহিমের পাই দশটিরও বেশী। তবে রচনাভঙ্গীর দিক দিয়ে গরীবুল্লাহ্‌র সঙ্গেই সৈয়দ হামজার তুলনা চলেঃ প্রতিভার সামর্থ্যে অন্যদের চেয়ে তিনি দীপ্তিমান।

দুই

আত্মপরিচয় দানের ব্যাপারে সৈয়দ হামজা কোনরকম কৃপণতা করেন নি। বিভিন্ন কাব্যে বেশ বিস্তারিত করে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত খবরাখবর দেবার চেষ্টা করেছেনঃ ফলে, তাঁর সম্পর্কে অযথা জল্পনাকল্পনার তেমন অবকাশ নেই। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে সেই অংশগুলো এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

ছৈয়দ হামজা বলে মোরসেদ ভাবনা।
ওহ্‌না বসতি যার ভুরসুট পরগণা॥
আমার বাপের নাম হেদাতুল্লা মীর।
তাহার বাপের নাম আবদুল কাদির॥
বিধাতা দিয়াছে দুই পুত্র মোর ঘরে।
কালোমদ্দি কুতুবদ্দি জগতে প্রচারে॥
তাহা সবায় কুশলে রাখেন করতার।
দুই পুত্রে লক্ষীলাভ প্রমাই অপার॥
মহদী মোল্লার হোক দুকুল উজালা।
কভু যেন কুলে তার নাহি পড়ে ম'লা॥

১। সুকুমার সেনঃ ইসলামি বাংলা সাহিত্য, পৃ ১০৮।

সাকিম বসন্তপুরে যাহার বসতি।
জার বাড়ি আঠার বৎসর মোর স্থিতি॥
তস্য জেষ্ঠ পুত্র সেখ খবু মোহাম্মদ।
তাহার গুণের আমি কি কহি[ব] হদ॥
গুণবান পঞ্চ ভাই মহিমা অপার।
একে একে বিবরিয়া কহিব সবার॥
করতার সবাকার কল্যান কুসলে।
পরিবার সমেত রাখেন কালে কালে॥
তস্য জেষ্ঠ পুত্র সেই গোলাম ইদরিছ।
বড়ই ভকত মোর গুণমান সিস॥
জন্মিল ইদের দিনে ভুবন মণ্ডলে।
তে কারণে নাম তার ইদু ইদু বলে॥
তাহার নিমিত্তে কৈনু কবিতা প্রচার।
নতুবা পুথীর চেষ্টা না ছিল আমার॥

[মধুমালতী]

আল্লার মকবুল সাহা গরিবুল্লা নাম।
বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম॥···
সায়েরি করিলেন পুথি আমীর হামজার।
না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেচ্ছার॥···
যতদুর আছে তার কবিতার হার।
দেখিয়া শুনিয়া লোকে হয় জারেজার॥···
না পারিনু এড়াইতে লোকের খাহেশ।
গাঁথিনু কবিতা আমি ভাবিয়া বিশেষ॥···
বোরহানার মাতারি যে আরব্বের বিচে।
ওতারিয়া ছিল বিবি পাহাড়ের নীচে॥

সেই হদ্দ সায়েরি হইয়াছিল আগে।
এগার শত নিরানব্বই সাল মাহা মাঘে ॥
না ছিল ওরক দুই কেতাব আখেরি।
এ খাতেরে আখেরি কহিতে হৈল দেরি ॥
বারো শত এক সালে বাঙ্গালার শেষে।
কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে ॥
কহিনু সায়েরি পুথি আখেরি কেচ্ছার।
লেখা গেল সাহাদাত আমির হামজার ॥

[আমীর হামজা]

রসুলের পাওতলে সৈএদ হামজা বলে
ঘর ছিল ভুরস্থট উদানা।
সন নিরানই সালে আমার কপাল-ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা ॥
চাষবাস যত ছিল বাড়ি ঘর সব গেল
ভরাডুবি হৈল মাঝমাঠে।
দেলেতে আফসোস বড়া হইয়া যে গাও ছাড়া
পরগণা বায়েড়া রাণাঘাটে ॥...
ভুরস্থট পরগণা বিচে উদানা বাগের নীচে
বসবাস কদিমি মোকাম।
আবদুল কাদের দাদা তার বড়া দেল সাদা
বাবা মোর হেদাতুল্লা নাম ॥
কলমদ্দি বড় বেটা কুতুবুদ্দি তার ছোটা
এই দুই মাসুম আমার।
এহা সবাকার তরে যে কেহ মেহের করে
আল্লাতালা ভাল করে তার ॥...

ত্রিপদী করিয়া ছন্দ করিয়া তারিখ বন্ধ
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে।
বার শত চারি সালে জোম্মার নামাজকালে
বাকি সে মাসের সাত দিনে॥

[জৈগুনের পুথি]

বারো শত নয় সালে একুশে ভাদ্দরে।
জুলুম ভেজিল কেয়ছা আলম উপরে॥
উত্তর পশ্চিম হইতে চালাইল বান।
আড়ে দিকে ত্রিশ ক্রোশ বহিল তুফান॥
তিরিশ হাজার লোক পালাইল বানে।
পেসাবের ঠাঁই নাই এত পেরেশানে॥
যেদিন আমতার বানে হানা গেল ছুটে।
ভাল ভাল লোকের হুরমত গেল টুটে॥…
মিয়া ইজ্জতুল্লা ইহা কহিলেন আমায়।
হাতেম তাইর কেচ্ছা লেখ বাঙ্গালায়॥…
শুরু করিলাম যবে পুথি লিখিবার।
না মিলে ফোরছত জীউ না হয় কারার॥
ছয় ছওয়ালের কেচ্ছা হইতে তামাম।
কলমের ঘোড়া মেরা তুড়িল লাগাম॥
এ খাতিরে সেইখানে দিয়াছিনু ক্ষমা।
কলিমোল্লা কহিলেন করিতে তর্জমা॥
ভুরসুট বসন্তপুরে বসতি মোকাম।
চান্দের ফরজন্দ সেখ করিমোল্লা নাম॥…
কালুর কথায় ফের ধরিনু কলম।
আল্লা যদি করে পুথি করিব খতম॥…

এমন জইফ কালে কালু মোল্লা মেরা গলে
লাগাইল মহব্বতের ফাঁসি।
আপনি পরম সুখে বসিয়া তামাসা দেখে
মরি আমি করি কসাকসি॥
নহেত এমন কালে কে কোথা কবিতা বলে
সত্তর সাল বয়স যাহার।
এই কামে দিন গেলু নিজ কাম না হইল
আছে মাত্র ভরসা আল্লার॥...
আছিনু বসন্তপুরে মইনদ্দি মোল্লার ডেরে
সেইখানে করিনু যতন॥
কেচ্ছা মধুমালতির জঙ্গনামা আমিরের
জৈগুন পুথি লিখেছিনু আগে।
আল্লাতালা ভাল করে যাহার খাহেস পরে
হাতেম লিখিনু শেষভাগে॥
মোরসেদের পাও তলে সৈয়দ হামজা বলে
ঘর যার উদানা মোকাম।
আছিল সৈয়দজাদা আবদুল কাদের দাদা
বাপ মীর হেদাতুল্লা নাম॥
একশও একুশ লিখে তার পিঠে শূন্য রাখে
সনের ঠিকানা পাবে তায়।
বাঙ্গালা আখেরি সালে গরমীর বাহার কালে
পুথির তারিখ লেখা যায়॥

[হাতেম তাই]

এই বৃত্তান্ত থেকে জানা যাচ্ছে যে, কবির পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী জেলার (তখনকার বর্ধমান জেলার) ভুরশুট[১] পরগণার অন্তর্গত উদনা গ্রামে। ১১৪০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৩৩-৩৪ খৃষ্টাব্দে কবির জন্ম হয়। উদনায় থাকতেই সম্ভবতঃ কবি 'মধুমালতী' রচনা শুরু করেন, শেষ করেন বসন্তপুরে এসে। রসিকদের অনুরোধে শাহ্ গরীবুল্লাহ্-প্রণীত 'আমীর হামজা' কাব্যের দ্বিতীয় পর্ব রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন। ১১৯৯ সালে কাব্যরচনায় ছেদ পড়ে, পরে ১২০১ সালে কাব্যটি তিনি সম্পূর্ণ করেন। ১১৯৯ সালেই দামোদরের হানায় কবি স্বগ্রাম ত্যাগ করে বায়েড়া (বাউড়িয়া) পরগণার রাণাঘাট গ্রামে এসে উপস্থিত হন। পরে তিনি বসন্তপুরে মঈনউদ্দীন মোল্লার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২০৪ সালে তাঁর 'জৈগুনের পুঁথি' রচিত হয়। মিয়া ইজ্জতউল্লাহ্‌র অনুরোধে তিনি 'হাতেম তাই' রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সমাপ্তির পূর্বেই কাব্যরচনায় বিরতি পড়ে; পরে শেখ চাঁদের আগ্রহাতিশয্যে এটি সম্পূর্ণ হয় ১২১০ সালে।

বহুকাল পূর্বে কবির স্বগ্রামনিবাসী জনৈক লেখক স্থানীয় কিংবদন্তীর ওপরে ভিত্তি করে সৈয়দ হামজার জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লেখেন: 'বাল্যকালে তিনি [কবি] অতি দুর্দান্ত ছিলেন। পিতা মীর সৈয়দ হেদায়তুল্লা হামজার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীগণের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।.... দীগ্‌রুই গ্রামের এক শিক্ষকের নিকট তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ

১। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষে কৃষ্ণ মিশ্র-রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে' রাঢ় অঞ্চলে ভূরিশ্রেষ্ঠিকা নগরীর উল্লেখ থেকে অনেকে মনে করেন যে এটি ছিল রাঢ়ের একটি প্রধান শহর, এমন কি, অন্ততঃ অবনীশূরের সময় থেকে শূর রাজাদের রাজধানী হওয়াও বিচিত্র নয়। 'ভূরিশ্রেষ্ঠ' কথাটা থেকে 'ভূরিশ্রেষ্ঠীকা' এসেছে, তার থেকে হয়েছে 'ভুরশেট' বা 'ভুরশুট'—এখন যা হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটা গ্রাম মাত্র।

দ্রঃ Nundolal Dey: Notes on the History of the District of Hugli, JASB, 1910.

হইল, দুষ্ট ছেলে এইবার শান্তশিষ্ট হইয়া অভিনিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। বিদ্যাচর্চার চতুর্থ বৎসরে সমগ্র কোরআন আবৃত্ত করিয়া হামজা 'সাদী' 'হাফেজ' 'বদায়ুনী' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণের কাব্য ও সাহিত্য অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন।···· এই সকল কবিতা পাঠে ও খেরদ আফজা কৃত দুইখানি পুস্তক অধ্যয়নে তিনি প্রায় নাস্তিক হইয়া যান। তাঁহার পিতা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া হাদিস শাস্ত্রাধ্যয়ন মানসে তাঁহাকে দূরদেশে প্রেরণ করেন।···কিছুদিন নানাস্থানে পর্যাটনান্তর হামজা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। এইসময় তাঁহার বয়স অনুমান সপ্তদশ বৎসর।···১১৫৭ সালে অষ্টাদশ বয়ঃক্রমকালে হামজার পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পাদিত হয়।···বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতাপ্রিয় ছিলেন। অসংখ্য কবিতা, পাঁচালি, হিঁয়ালি ছড়া প্রভৃতি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ···১১৮৯ সালে তিনি "মধুমালতী" নামক গ্রন্থখানি বিরচনে যত্নবান হন। গ্রন্থখানির ত্রিচতুর্থাংশ লিখিবার পর তাঁহার পিতা মরজগৎ হইতে পবিত্র নিত্যধামে প্রস্থান করেন ; সুতরাং পিতৃশোকে উদাসীন প্রায় হইয়া কিয়দ্দিন মধুমালতীর রচনা বন্ধ রাখেন ও হাওড়া জেলার বসন্তপুর নিবাসী মেহদী মোল্লার বাটীতে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ইহার বাটীতে ১১৯৪ সালে প্রথম স্থান লইয়া সপরিবারে আঠার বৎসর কাল অবস্থিতি করেন ও অসম্পূর্ণ মধুমালতীর উপসংহার করেন (১১৯৫)। অন্যূন বিংশ বৎসর বসন্তপুরে শিক্ষকতার কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কবিবর নিশ্চিন্তমনে "জৈগুণ", "আমির হামজা" ও "হাতেম তাই" রচনা করেন। বিষয়সম্পত্তি ও গৃহাদি পর্য্যবেক্ষণ জন্য নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে উদনা গ্রামে আগমন করিতেন। তাঁহার পুত্রগণ কৃষিকার্যের তত্ত্বাবধান করিয়া উদনা গ্রামেই বসবাস করিতেন।···১২১১ সালে বসন্তপুরের কার্য ত্যাগ করিয়া উদনায় পুনরাগমন করেন। ১২০৯ সালের জলপ্লাবনে তাঁহার গৃহাদি উৎসন্ন হওয়ায় বসন্তপুরের ও উদনার বদান্য জনগণের সাহায্যে পুনরায় বাটী নির্মাণ করিয়া ১২১৪ সাল পর্যন্ত উদনায় অবস্থান করেন। একটি ব্যাধির প্রকোপে ভগ্নস্বাস্থ্য হইলে বসন্তপুরের কয়েকটি ছাত্র ও অনুগ্রাহকবর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে ১২১৪ সালের প্রথমে তিনি পুনরায় বসন্তপুরে যাত্রা করেন,

ইহার পরে আর তাঁহাকে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় নাই। ১২১৪ সালে এতদ্দেশবাসী আবালবৃদ্ধবণিতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া এই অমর কবি অমরধামে গমন করেন।....কবির মৃতদেহ বসন্তপুরে সমাধিস্থ হয়।''[১]

জীবনীকার '১২০৯ সালে উপর্যুপরি দুইবার ভীষণ বন্যা'র কথা বলেছেন। তবে এর আগেও কবিকে বন্যাপীড়িত হতে হয়েছিল। ১১৯৯ সালে বন্যার হানায় তাঁকে যে ভিটে ছাঁড়তে হয়েছিল, 'জৈগুনের পুঁথি'তে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কেউ বলেছেন : '...অতঃপর তাঁহাকে [কবিকে] শাহ্ গরীবুল্লাহ্‌র আশ্রয়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকটা সংযত হয়, এবং বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ বাড়ে। তিনি সংসারের প্রতি এমনিতেই ছিলেন উদাসীন, তার উপর ফকির গরীবুল্লাহ্‌র সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিতে আরও উদাসীনতা আসে।'[২] লেখকের এই মন্তব্যের ভিত্তি কি, তা জানা না যাওয়ায় এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। গরীবুল্লাহ্‌র সঙ্গে সৈয়দ হামজার ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকলে 'আমীর হামজা' কাব্যে হামজা তার উল্লেখ করতে ছাড়তেন না।

সৈয়দ হামজার নামে পূর্বোক্ত কাব্যগুলো ছাড়াও, 'সোনাভান' ও 'লালমোন' বলে দুটি কাব্য প্রচলিত আছে। দুটির একটিতেও কিন্তু হামজার ভণিতা নেই। 'সোনাভানে'র ভণিতা পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে এটি গরীবুল্লাহ্‌র রচনা। 'লালমোনে' আরিফের ভণিতাই আছে সর্বত্র।

সৈয়দ হামজার জীবনীপ্রসঙ্গে আমাদেরকে একটিমাত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—যার সমাধানও খুব সন্তোষজনক নয়—তা হল 'মধুমালতী' কাব্যের রচনাকাল নির্ধারণ। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত 'মধুমালতী'র পাণ্ডুলিপির লিপিকাল—"সন ১২১৩ সালে বড় মাহ জেষ্ঠ রোজ সনিবার বেলা আড়াই

১। শেখ আবদুর রহমান : বঙ্গের আদিকবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ, আল-এসলাম, পৌষ-মাঘ, ১৩২৩।
২। অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ : সোনাভান। ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৩৬২।

প্রহরের সময়"[১]—এই কাব্যরচনার নিম্নতম তারিখ নির্দেশ করে। অন্যদিকে, রচনাকালের উল্লেখ না থাকলেও, নানাকারণে 'মধুমালতী' তাঁর প্রথম রচনা বলে মনে হয়। 'হাতেম তাই' কাব্যে কবি স্বলিখিত কাব্যগ্রন্থের যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে 'মধুমালতী'র উল্লেখ করেছেন সর্বপ্রথমে; বাকী বইগুলোর উল্লেখ যে কালানুক্রমিকভাবে করা হয়েছে, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে; সুতরাং সর্বাগ্রে 'মধুমালতী'র উল্লেখ সম্ভবতঃ একে কবির প্রথম রচনারূপে গ্রহণ করারই ইঙ্গিত দেয়। তাছাড়া, 'মধুমালতী' কবির একমাত্র কাব্য যা কিনা মিশ্র ভাষারীতির নয়। এ থেকেও এই অনুমানের সুযোগ আছে যে, কবি প্রথমে 'মধুমালতী' রচনা করেছিলেন; পরে 'আমীর হামজা'র উত্তরার্ধ রচনা করতে গিয়ে তিনি মিশ্র ভাষারীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তী কাব্য দুটিতেও মিশ্র ভাষারীতি গ্রহণ করেন। 'মধুমালতী'তে দামোদরের হানার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় যে, এটি ১১৯৯ সালের আগেই লেখা হয়ে থাকবে।

অতএব, আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে অনুমান করা চললেও যথাযথ তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ডক্টর সুকুমার সেন যদিও একবার বলেছেন যে, এ কাব্য রচিত হয়েছিল "১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে"[২], কিন্তু তিনি নিজেই আবার স্বীকার করেছেন যে, ১১৯৯—১২০১ সালে রচিত 'আমীর হামজা' কাব্য রচনার পূর্বেই মধুমালতী লেখা হয়েছিল[৩]। কিংবদন্তীর ওপরে নির্ভর করে কবির জীবনীকার বলেছেন যে, 'মধুমালতী' রচনার সূত্রপাত হয়েছিল ১১৮৯ সালে এবং এটি সম্পূর্ণ হয় ১১৯৫ সালে।[৪] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই মতই

১। Blumhardt : Catalogue of Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India Office, p 14

২। সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত, পৃ ৪১।

৩। ঐ, পৃ ১০৯।

৪। শেখ আবদুর রহমান : পূর্বোক্ত।

গ্রহণ করেছেন।[১] ডক্টর এনামুল হক লিখেছেন যে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই কাব্য রচিত হয়েছিল।[২] সম্ভবতঃ তিনিও এই একই উৎস থেকে রচনাকাল পেয়েছেন।

আমাদের অনুমতি রচনাকালের সঙ্গে এই কিংবদন্তীর সঙ্গতি আছে। কিন্তু এই তারিখ গ্রহণ করার আগে একটি কথা ভেবে দেখতে হয়। 'মধুমালতী'র উপসংহারে কবি আঁঠারো বৎসর বসন্তপুরে থাকার কথা বলেছেন। জীবনীকারের মতে, কবি বসন্তপুরে প্রথম আসেন ১১৯৪ সালে। এই হিসেবে 'মধুমালতী'র রচনাকাল হয় ১২১২ সাল ঃ অথচ ১২১০ সালে লেখা 'হাতেম তাই'তে 'মধুমালতী'র নাম করা হয়েছে। ভিন্ন প্রমাণের অভাবে ১১৯৫ সালে 'মধুমালতী'-রচনা সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরে নিলে, হয় কাব্যের ঐ চরণ দুটিকে প্রক্ষিপ্ত বলতে হবে, নয়তো বলতে হবে যে, কবি বসন্তপুরে আসেন ১১৭৭ সালে। আবার, বসন্তপুরে যখনই আসুন না কেন, ১১৯৯ সালের বন্যার সময়ে কবি উদনায়ই বাস করতেন।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়।[৩] সে সংবাদ সৈয়দ হামজা পেয়েছিলেন। এবং আশাও প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে সর্বত্র প্রচারিত হবে। 'আমীর হামজা' কাব্যের উপসংহারে তিনি বলছেন ঃ

না করি বারণ কারে পুথি ছাপিবার।
না ছোটে ওজন যেন দোহাই আল্লার॥

তাঁর আশা পূর্ণ হতে খুব বেশীদিন লাগেনি। 'মধুমালতী'র মুদ্রিত সংস্করণের সবচেয়ে পুরানো তারিখ হচ্ছে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ।[৪] 'আমীর হামজা' কাব্যের প্রথম

১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ঃ সৈয়িদ হামযা। দিলরুবা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩।

২। মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ ২৯৪।

৩। Nundolal Dey : পূর্বোক্ত।

৪। সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯২২, পাদটীকা।

মুদ্রণ হয় সম্ভবতঃ ১২৬৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৭তে।[১] বৃটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ছাপা 'জৈগুনের পুঁথি' এবং ১৮৬৫তে মুদ্রিত 'হাতেম তাই' আছে।[২] এর আগেও এ কাব্যগুলো ছাপা হয়েছিল কি না, জানি না। তবে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লঙের পুস্তকতালিকায় বটতলা থেকে মুদ্রিত 'আমীর হামজা' 'জৈগুন' ও 'হাতেম তাই'য়ের উল্লেখ আছে।[৩] এগুলো যদি হামজার বই হয়ে থাকে, তবে সবকটি বইয়েরই প্রথম মুদ্রণের কাল আরো এগিয়ে দিতে হয়।

তিন

'মধুমালতী' সৈয়দ হামজার প্রথম রচনা বলে অনুমিত হতে পারে। এটি তাঁর মৌলিক রচনা নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ বলতে যা বোঝাতো, তাই। যে মূল কাব্য অবলম্বনে হামজা এটি রচনা করেছিলেন, তার সম্পর্কে কোন ইংগিত তিনি দেন নি। তবে 'মধুমালতী'র কাহিনী কেবল বাংলায় নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও সুপরিচিত ছিল। দৌলত কাজী তাঁর 'সতী ময়না' কাব্য[৪] রচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

মধুমালতির লাগি বিরাগী হইয়া।
মনোহর গেল মা ও বাপ তেয়াগিয়া ॥

অধ্যাপক আহমদ শরীফ ছ'জন 'মধুমালতী'-রচয়িতার নাম করেছেন।[৫] এঁরা হচ্ছেন ঃ মুহম্মদ কবীর (ষোড়শ শতাব্দী)[৬], মুহম্মদ চুহর (অষ্টাদশ শতাব্দী)[৭],

---

১। সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯১৯, পাদটীকা।

২। Blumhardt : Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum, P 31.

৩। Long : A Descriptive Catalogue of Bengali Works.

৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত : সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী। সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৩৬২।

৫। আহ্মদ শরীফ : মনোহর-মধুমালতী। সমকাল, কার্তিক, ১৩৬৪।

৬। এঁর 'মধুমালতী' অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশের অপেক্ষায়।

৭। মুহম্মদ চুহরের কাব্যখানি পাওয়া যায় নি ; তাঁর অন্য কাব্যে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

সৈয়দ হামজা (অষ্টাদশ শতাব্দী), শাকের মামুদ (অষ্টাদশ শতাব্দী), গোপীনাথ দাস (উনবিংশ শতাব্দী) ও জোবেদ আলী (বিংশ শতাব্দী)। ডক্টর এনামুল হক বলেছেন যে, শাহ গরীবুল্লাহ্ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন।[১] গরীবুল্লাহ্‌র এই কাব্যের সন্ধান আমরা এখনো পাই নি। 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে গরীবুল্লাহ্‌র আলোচনা প্রসঙ্গে[২] তিনিও আর এই কাব্যের উল্লেখ করেন নি। এ থেকে মনে হয় যে, এ উক্তি সম্ভবতঃ অসতর্কতাপ্রসূত এবং গরীবুল্লাহ্‌ 'মধুমালতী' রচনা করেন নি।

মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' ফারসী কাব্য অবলম্বনে—ভিন্ন পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী হিন্দী কাব্য অবলম্বনে—রচিত হয়েছিল ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে।[৩] শাকের মামুদের কাব্যের নাম 'মধুমালা'। তিনি লিখেছেন ঃ

মধুমালা মনহর কিতাব নিকটে।
পাইয়া পাঁচালি দীর্ঘ রচি কহো ঝাটে॥
আনন্দ উৎসবে মন ইদের দিবসে।
সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে॥
একাদশ শত সাল উন অষ্ট আসি।
ফারসি বাঙ্গালা ভাষা হৃদয়ে প্রকাশি॥
বয়ক্রম শুন মোর কুড়ি পর দুই।
বাইশ বছর জান না বুঝি প্রমাই॥[৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে, কোন ফারসী কাব্য অবলম্বনে ১৭৮১-৮২তে এটি রচিত হয়েছিল।

১। মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মধুমালতী। বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য, পৃ ১৯।

২। পৃ ২২৪ দ্রঃ।

৩। মুহম্মদ এনামুল হক ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ১৬।

৪। কালীকান্ত বিশ্বাস ঃ প্রাচীন পুঁথির বিবরণ। ব-সা-প-প, ১৩১৮।

'মধুমালতী'র কাহিনী যে মূলত ভারতীয়, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভারতীয় ভাষা থেকে সে কাহিনী অবশ্য ফারসীতেও অনূদিত হয়েছিল। শেখ মন্‌ঝন-রচিত হিন্দী 'মধুমালতী'র ফারসী অনুবাদ করেন মুনশী আলী রিজা—১০৫৯ হিজরীতে। এর ছ' বছর পর (১০৬৫ হিজরী) এই একই উপাখ্যান নিয়ে 'মিহর ও মাহ্‌' নামে একটি কাব্য প্রনয়ণ করেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রিয় সহচর মীর আসকারী—যাঁর তাখাল্লুস ছিল রাযী। নাসির আলীর মসনবীর মধ্যে মনোহর-মধুমালতী উপাখ্যানের আরেকটি ভাষ্য পাওয়া গেছে—শেখ জুম্মন-রচিত হিন্দী কাব্য থেকে এটি অনূদিত হয়েছিল।[১]

শেখ জুম্মন ও মন্‌ঝনের হিন্দী 'মধুমালতী' সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা।[২] তবে ষোড়শ শতাব্দীতে মালিক মুহম্মদ জায়সীও এই কাহিনীর উল্লেখ করেছিলেন।[৩] মুহম্মদ কবীরের রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকে গোলযোগ না থাকলে বলতে হয় যে, এইসব কাব্যের পূর্বেও হিন্দী-ফারসীতে 'মধুমালতী' কাব্য রচিত হয়েছিল।

সৈয়দ হামজা সম্ভবতঃ কোন ফারসী ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

মধুমালতীর কথাবস্তু সংক্ষেপে এই ঃ

বঙ্গরাজ্যের প্রধান রাজন সূর্যভান ও রানী কমলাসুন্দরীর একমাত্র পুত্র মনোহর বারো বৎসর বয়সে রাজা হন। তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে পরীর দল নিদ্রিত মনোহরকে পালঙ্কসমেত উড়িয়ে নিয়ে গেল মহারসের রাজা বিক্রম ও রানী রূপমঞ্জরীর কন্যা মধুমালতীর শয়নঘরে। উভয়ের মধ্যে পরিচয়, প্রণয় ও অঙ্গুরীয়বিনিময় ঘটল ঃ মনোহর নিদ্রা গেলেন মালতীর পালঙ্কে, আর মালতী শয়ন করলেন মনোহরের পালঙ্কে। তখন পরীরা মনোহরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনল। প্রণয়োন্মাদ হয়ে মনোহর রাজকন্যার সন্ধানে বের হলেন।

১। Rieu: Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, vol ii, pp 803, 698-99 & 700.

২। আহমদ শরীফ ঃ পূর্বোক্ত।

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ পূর্বোক্ত।

অনেক পথ অতিক্রম করে তিনি এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় প্রবেশ করলেন এবং সেখানে দৈত্যের হাতে বন্দিনী বিচিত্রবিশ্রামরাজ চিত্রসেনের কন্যা প্রেমাকে দেখতে পেলেন। দৈত্যবধ করে মনোহর উদ্ধার করলেন প্রেমাকে। প্রেমা ছিলেন মালতীর সখী—তাঁর দৌত্যে মনোহর-মধুমালতীর মিলন ঘটল, কিন্তু তাঁদেরকে একত্র দেখতে পেয়ে রানী রূপমঞ্জরী প্রেমাকে গঞ্জনা দিলেন এবং মালতীকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়ে মন্ত্র পড়ে শুকপক্ষী করে উড়িয়ে দিলেন। শুকপক্ষী ধরা পড়ল মাণিকনগরের রাজা তারাচাঁদের কাছে: শুকপক্ষী মালতী আত্মপরিচয় দিলে সহানুভূতিশীল তারাচাঁদ রাজা বিক্রমের কাছে ফিরিয়ে আনলেন তাঁকে। রানী মন্ত্র পড়ে আবার তাঁকে পূর্বরূপে ফিরিয়ে আনলেন। তারাচাঁদের কাছ থেকে বিক্রম মনোহর-মালতীর প্রণয়ের কথা জানলেন এবং প্রেমা ও চিত্রসেনের মধ্যস্থতায় মনোহরকে কন্যাদান করলেন। এরপর আকস্মিকভাবে প্রেমাকে দেখে তারাচাঁদ আসক্ত হয়ে পড়লেন ঃ মনোহর-মালতীর দৌত্যে তাঁদের বিবাহ হল। কিছুদিন মহানন্দে কালযাপনের পর তাঁরা নিজেদের রাজ্যে ফিরলেন।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান হিসেবে 'মধুমালতী'র কাহিনীকে সাধারণই বলব। এ কাহিনীর মধ্যে তেমন কোন জটিলতা নেই। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সমস্ত কাব্যের ওপরে মোটা প্রলেপ লাগিয়ে গেছে। পরীদের সাময়িক লীলাখেলার ক্রীড়নক মনোহর ও মালতীর ক্ষণিক মিলনেই সমগ্র কাহিনীর মূল নিহিত। তারপর পঞ্চমুণ্ড দশচক্ষু দশহস্ত রাক্ষসের হাতে বন্দিনী রাজকন্যার উদ্ধারকার্য রূপকথার অতীন্দ্রিয় জগতেই পাঠককে বন্দী করে রাখে। সবশেষে মধুমালতীর metamorphosis—শুকপক্ষী হওয়া এবং পুনরপি রূপান্তরগ্রহণ—এক ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় জাগরুক করে। অবশ্য সেযুগের পাঠকের কল্পনায় যে এই অতিপ্রাকৃত জগত বাস্তবের সকল সত্যতা নিয়ে বর্তমান ছিল, এতে সন্দেহ নেই ঃ কিন্তু সমগ্র কাব্যে যেসব ঘটনা (event) ঘটেছে, তার সবকটিই হয় এই অতিপ্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি, নয় এর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত। এক্ষেত্রে ঘটনার স্বাধীন বিকাশ যেমন ঘটেনি, চরিত্রসমূহের পরিপূর্ণ প্রকাশও তেমন হয় নি।

অবশ্য এরই অন্তরালে সমাজের উপস্থিতি পাঠকের গোচরীভূত না হয়ে পারে না। সে সমাজ কেবল অতিপ্রাকৃত জগতের চেয়ে স্বতন্ত্র নয়, বরঞ্চ অতিপ্রাকৃত পরিবেশের ইঙ্গিত পরিণামের সঙ্গে তার বিরোধও আছে। মনোহরের জন্মমুহূর্তে সূর্যভান 'পাত্রমিত্র ডাকাইয়া করিল সমাজ' এবং মনোহরের হাতে রাজ্যভার অর্পণের সময়েও 'সমাজ করিয়া তবে বসিল রাজন' কিংবা প্রেমার প্রত্যাবর্তনে চিত্রসেন 'আনন্দিত হইল যে সমাজ সহিত'—এইসব অংশে সমাজ বলতে রাজ্যশাসনের সহায়ক ব্যক্তিদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম দর্শনে মালতী যখন মনোহরকে বলছে ঃ

অকুঙারী কন্যা আমি রাজার কুমারী।
কেমন তোমার সঙ্গে আলিঙ্গন করি॥
একথা প্রকাশ হৈলে হবে বড় লাজ।
কতজনে গভরে গাড়িবে মহারাজ॥
সহজে হইবে তার কুলের খাঁকার।
তোমার সহিত প্রাণ বধিবে আমার॥

অথবা রূপমঞ্জরী যখন প্রেমাকে ধিক্কার দিচ্ছেন ঃ

কলঙ্ক করিলি মোর সংসার জুড়িয়া

কিংবা তিনি যখন রাজা বিক্রমকে বলছেন ঃ

যোগ্য কন্যা যার ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি তারে
নিরবধি মনে মনস্তাপ

তখন আমরা যে সমাজ ও সংসারের পরিচয় পাই, তা আমাদের অতি পরিচিত।

সমাজের চেহারাটা অন্যভাবেও দেখা যায়। পাত্রপাত্রীর আচরিত রীতিনীতি সম্পর্কে সৈয়দ হামজা বেশ সতর্ক ছিলেন। তাই পুত্রের জন্মে ব্রাহ্মণভোজন ও পারিতোষিক দান, জন্মপত্র লিখন, পাঠশালায় শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিবাহোৎসবের বর্ণনায় হিন্দু রীতিনীতির অনুসৃতি দেখি। অবশ্য এই সতর্কতা সত্ত্বেও মুসলমান

সমাজের প্রচলন-অনুযায়ী কবি মনোহরের গলায় তাবিজ পরিয়েছেন ও বিবাহবাসরে আতরের আমদানী করেছেন। কিন্তু তবুও কবি মূলত নির্লিপ্ততার পরিচয়ই দিয়েছেন। তাই চিত্রসেন

আপনি রাজন করিল গমন
শ্রীহরিকে ঠেওয়াইয়া

আবার, সখীদের উক্তি,

মনে মনে ভজ ভগবান

এসব ক্ষেত্রে কবির যে সচেতনতার পরিচয় পাই, তার উল্লেখ করতে হয় এইজন্যে যে, মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে এমন নমুনার অভাব নেই, যেখানে হিন্দু পাত্রপাত্রী 'হেন দশা কেন মোর করিল খোদায়' ব'লে আক্ষেপ করছেন।[১]

আরেকটা কথা। এই কাব্যে বারবার 'কাণ্ডার বাঙ্গালের' কথা বলা হয়েছে :

(১) কাণ্ডার বাঙ্গাল দেহ সঙ্গে লোকজন
(২) নানাধনে কাণ্ডার বাঙ্গাল হৈল বশ
(৩) কাণ্ডার বাঙ্গাল ভাসে নায়ের নফর

সৈয়দ হামজার কালে কাণ্ডারীমাত্রই কি পূর্ববঙ্গীয় হত ? নইলে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য কবিও একইরকম উক্তি করবেন কেন ?[২]

চরিত্রসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় নি বলতে আমি একথা বোঝাতে চেয়েছি যে, এখানে বিভিন্ন চরিত্র কবির মনোগত আদর্শানুযায়ী এক একটি গুণের ভার বহন করে চলেছে—দোষগুণের সমন্বয়ে তাদের চরিত্র গড়ে ওঠে নি বা গুণাবলীর সমন্বয় তাদের চরিত্র থেকে উৎসারিত হয় নি। মালতীর মধ্যে শুধু প্রণয়ের আবেগ ও বিরহের হাহাকারই লক্ষ্যযোগ্য (তাঁর

১। ওয়াজেদ আলীর নামে প্রচলিত 'সত্যপীরের পুথি' দ্রষ্টব্য।

২। (ক) 'কাণ্ডারী বাঙ্গাল যত বুদ্ধির সাগর।
খুলিয়া ডিঙ্গার কাছি তুলিল লঙ্গর॥'—ঐ
(খ) 'ডাড় টানিতেছে বসি নির্বোধ বাঙ্গাল।'
—আবদুর রহিম : প্রেমলীলা (১৮৬১)

প্রণয় অবশ্য কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত, কেননা মনোহরকে তিনি ভালবেসেছিলেন 'মরিলে ইহার বধ লাগিবে আমায়' ভেবে)। মনোহরেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য তাই, তবে তাঁর কিছু অতিরিক্ত গুণ আছেঃ তিনি প্রজাপালক নৃপতি ও দুষ্টদমনকারী বীর—প্রেমার উদ্ধারসাধনে তিনি chivalryর পরিচয় দিয়েছেন। তবে রাক্ষসবধের পর 'মানিক মুকুতা আর রজত কাঞ্চন' দেখে হরষিত হয়ে 'কাপড়ে বান্ধিয়া কত লিল মনোহর' পড়ে মনে হয় যে, তিনি বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ বিষয়ীও বটেন। এ সবই হয়তো নায়কোচিত গুণ, কিন্তু তাঁর বয়সটা চোদ্দ-পনেরোর কোঠায়, সে কথা স্মরণ করলে তাঁর দেহমনের এ হেন শক্তির পরিচয়ে বিস্মিত হওয়া চলে, বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। তারাচাঁদ পরোপকারী রাজন। হৃদয়রাম লক্ষ্মণসদৃশ অনুজ। প্রেমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মালতীর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমার ভূমিকা এত গৌণ হয়ে গেল যে তার পরিণতি ঘটল না। রানী রূপমঞ্জরী ভয়ংকরা, মন্ত্রে তন্ত্রে সিদ্ধহস্তঃ কন্যার জন্যে তাঁর কাতর বিলাপ পাঠকের মনে কোন রেখাপাত করে না।

রচনারীতির দিক দিয়ে 'মধুমালতী' কাব্যে সৈয়দ হামজার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের তেমন পরিচয় নেইঃ এক কথায়, তিনি প্রথানুগত। প্রথম দর্শনে মালতীর 'রূপ হেরে মনোহর হইল মূর্চ্ছিত'ঃ এখানে রূপবর্ণনার সুযোগ না নিয়ে একেবারে বিবাহানুষ্ঠান বর্ণনাপ্রসঙ্গে বেশ সুচারুভাবে সে কর্তব্য সম্পন্ন করেছেনঃ

সহজে রূপের ভারে আপনি চলিতে নারে
নবিন যৌবন তাহে ভার।
রূপের মুরারী বালি ক্ষেণমধ্যে পড়ে ঢলি
কেমনে বহিবে অলঙ্কার॥
চন্দ্রের জিনিয়া রূপ সূর্য্যের যেমন ধূপ
আভরণে কিবা প্রয়োজন।…

মুখ তার পূর্ণ শশী তাহে প্রকাশিল আসি
বহুমূল্য মুকুতার ঝারা ।
কেশ ঝাড়া কর্ণমূলে তাহাতে মুকুতা দোলে
চাদকে বেড়িয়া যেন তারা ॥
কি কব বেশের ঘটা নয়নে কাজল ফোটা
ভঙ্গিমা চাহনি মহাবাণ।
অপরূপ ভুরুজোড়া ধনুকেতে দিয়ে চাড়া
রসিকে বধিতে অনুমান ॥···
ওষ্ঠ দুটী বিম্ব ফল দন্ত করে ঝলমল
যেন পাকা ডালিম্বের দানা ।
একে ত নবযৌবন তাহে অতি সুগঠন
বর্ণ জিনিয়া কাঁচা সোনা ॥

এখানে সেকালের আদর্শে কবি হয়ত প্রশংসা দাবী করতে পারেন, কিন্তু প্রেমার রূপবর্ণনা যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি গুণহীন। তবে কবির কিছু কিছু উপমা ব্যবহারের পদ্ধতি প্রশংসনীয়। যেমন,

যেন প্রিয়া বিনে পোড়ে হুতাসনে
প্রিয়াবিরহিনী রামা ।
জলজন্তুগণে মরে জল বিনে
তেমতি আছিল সামা ॥
বিদ্যাহীন নর পুত্রহীন ঘর
চিরণীবিহনে কেশ ।
যশহীন প্রজা প্রজাহীন রাজা
রাজাহীন যেন দেশ ॥
ধনহীন পুরী পতিহীন নারী
জলহীন সরোবর ।

ফলহীন বৃক্ষ রসহীন ইক্ষু
মধুহীন মধুকর ॥

কিংবা প্রেমা-তারাচাঁদের মিলনে,

বসন্তের কালে মরা বৃক্ষ ডালে
মুঞ্জরী ধরিল তায় ।
রবিতাপে জ্বালা পেয়ে বৃক্ষতলা
জুড়াইতে বসিল রায় ॥
অন্নহীন লোকে উপহার ভোগ
পাইল কাঞ্চন থালে ।
জলহীন নর পেয়ে সরোবর
পড়িল অগাধ জলে ॥
এমনি প্রাকার রাজার কুমার
আনন্দ বাড়িল মনে ।

'মধুমালতী' কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এর ভাষা ঃ এটি মিশ্র ভাষারীতির কাব্য নয়, মধ্যযুগীয় কাব্যের সাধারণ ভাষায় এটি লেখা হয়েছে। পরবর্তী বই তিনটের সঙ্গে মধুমালতীর প্রধান পার্থক্য এখানে। অবশ্য হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি। তাই এখানে আমরা 'মাঙ্গাইয়া' 'লিয়া' 'দোন' 'আসক' 'লোগ' 'ছামান' 'মেওাজাত' 'নফর' 'বহিন' 'প্রিয়া' (পুংলিঙ্গ) 'উদাসিনী' (পুংলিঙ্গ) 'ওখাড়িয়া' 'পিয়ার' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। এছাড়া, এই ভাষার কোন বিশেষত্ব নেই—সৈয়দ হামজার হাতে এ ভাষায় বিশেষ কোন সৌন্দর্য বা মাধুর্যের সৃষ্টি হয় নি। তবু মধুমালতী কাব্যের ভাষাকে যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলেছি, তার কারণ নেতিবাচক—অর্থাৎ এটি মিশ্র ভাষারীতির নয় বলে। সৈয়দ হামজাই বোধহয় মিশ্র ভাষারীতির একমাত্র কবি, যিনি অন্তত একটি কাব্যেও এই ভাষা গ্রহণ

করেছিলেন, যে ভাষাকে তাঁর অনুবর্তীরা 'সংস্কৃত' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং কাব্যরচনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি।'

চার

গরীবুল্লাহ্‌র কাব্য-আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, কল্পনামূলক ফারসী কাব্য 'কিস্‌সা-ই-আমীর হামজা' অবলম্বনে বাংলায় ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের আবদুল নবী 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন এবং আনুমানিক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গরীবুল্লাহ্‌র 'আমীর হামজা'র প্রথম ''বালাম' রচিত হয়। রসিকদের অনুরোধে সৈয়দ হামজা এর দ্বিতীয় পর্ব রচনা শুরু করেন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে, রচনা শেষ হয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যের শেষার্ধ হিসেবে রচিত হয়েছিল বলে কবি পূর্বসূরীর আদর্শে মিশ্র ভাষারীতিতেই এটি রচনা করেন। শুধু তাই নয়, এর পর থেকে কেবল এই ভাষারীতিতেই তিনি কাব্য প্রণয়ন করেছেন।

হজরত মুহম্মদের পিতৃব্য আমীর হামজার শৌর্যবীর্যের পরিচয় দান এই কাব্যের লক্ষ্য। ইসলামের নবীর জন্মলাভের বহু পূর্বেই আমীর হামজা ইসলামপ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, কাব্যের প্রথম পর্ব থেকে সেটাই মনে হয়। দ্বিতীয় পর্বে, সৈয়দ হামজার রচনায়, আমরা অবশ্য দেখতে পাই যে, হামজা ইবরাহীম নবীর দীন প্রচার করছেন। তাঁর আদেশে আব্বাস হোমুম বাদশাকে লেখেন ঃ

১। যেমন, মুনশী মালে মোহাম্মদ আলাওলের 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্যকে লোকবোধ্য ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন ঃ

এই পুথি সায়ের ছিল আগু জমানার।
সংস্কৃত সাধু ভাষায় হইল তৈয়ার॥
পড়িতে বুঝিতে লোকের বড়ই কছেল্লা।
তে-কারণে অধীন রচে চলিত বাঙ্গালা॥

—সয়ফলমুলুক বদিওজ্জামাল (১২৩৫)

একিদায় আন তুমি আল্লাকে ইমান ॥
এবরাহিম নবির দিন পরে কর কাম।
নহে ত বড়ই দুঃখ পাবে পরিণাম ॥

ইবরাহীম নবীর দীনে পানাহার সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল কি না, জানি না। কাব্যে কিন্তু বারবার আমীর হামজাকে দেখতে পাই 'করেন পেয়ালাবাজি খোসাল খাতির' এবং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁর যে 'মস্তহালে'র বর্ণনা আছে, সেটা পারস্যের সামাজিক জীবনের সঙ্গে হয়তো বেমানান নয়, কিন্তু ইসলামের পয়গম্বরের নির্দেশের বিরোধী।

এই কাব্যে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাব্যের সবচাইতে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে passionএর তীব্রতা। রণক্ষেত্রে, নৃত্যগীত-পেয়ালাবাজিতে এবং নারীর আসঙ্গলিপ্সায় একই মদোন্মত্ততার প্রকাশভেদ হয়েছে মাত্র। অস্বাভাবিক ঘটনাকে যদি অতীন্দ্রিয় বলে আখ্যা দেওয়া চলে, তবে বলতে হয় যে, এ কাব্যেও অতীন্দ্রিয়তার পরিচয় আছে। হামজার প্রণয়িনী ও পরবর্তীকালে গৃহিনী বাদশাহ নওশেরওয়ঁার কন্যা মেহেরনিগারের কাছে একদা তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন যে, মেহেরের জীবদ্দশায় তিনি অন্য নারী গ্রহণ করবেন না। কিন্তু মেসেরের যুদ্ধ করে তিনি যখন নাসিরকে রাজত্ব দিলেন, তখন নাসিরের আগ্রহাতিশয্যে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে অনুগ্রহ করলেন। সেই পরিণীতাকে তিনি 'ছেরের দৈস্তার' (মাথার টুপি?) দিয়ে এসেছিলেন এবং সেই 'দেস্তারের বরকতে'ই তাঁর গর্ভে উম্মর ইউনানির জন্ম হয়। কিছুকাল পর হামজার সঙ্গে ইউনানী মিলিত হলে মেহেরনিগার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ও অসত্য বলে গণ্য করে হামজাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে অপরাধী করলেন।

মেহেরনিগারের মৃত্যুর পর 'কারুনের বহিনকে আমীর সাদি করে'। তারপর ফতেনুসের কন্যা রাবিয়া পানলপোসকে—'ছুরত দেখিলে তার পরি ঝক মারে' এবং যিনি হামজাকে না দেখেও আশৈশব তাঁর নাম জপ করতেন—আমীর

হামজা গ্রহণ করলেন। মেহেরনিগার জীবিত থাকলে হয়তো এ ঘটনাও অবিশ্বাস করতেন, কেননা তাঁর বাস্তবতাজ্ঞান আমাদের পর্যায়ের বলেই মনে হয়। যাহোক, এরপর এক ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল—আমীরের কাছে আত্মনিবেদন করলেন নওশেরওয়াঁর স্ত্রী :

বিবি কহে হাল মেরা শুনহে আমির।
বাঁদসার আওরত আমি নাম আওরঙ্গির ॥
তোমার তারিফ শুনে হয়েছি আসক।
আসক আগুনে আর জ্বলিব কব তক ॥
আসকে পুড়িয়া মরি দেখা নাহি পাই।
এ খাতেরে রাতকালে আসি তেরা ঠাঁই ॥
মতলব হাছেল পাছে না কর আমির ॥
কয়েদ করিনু তুঝে ইহার খাতির ॥
আমার খাতেরে তুমি হও রওাদার।
আসক আগুনে তবে পাই যে নিস্তার ॥
তোমাকে ছাড়িয়া দিয়া যাই আমি ডেরে।
তুমিও চলিয়া যাও আপনা লস্করে ॥
আমির কহেন তুমি বাদসার আওরত।
তুমি এয়ছা বাত কহ কেয়ছা হকিকত ॥...
নওসেরওা কহে মুঝে ফরজন্দ বলিয়া।
মায়ের সমান তুমি দেখ না বুঝিয়া ॥

তবে গিলানী শহরের বাদশাহ গাঞ্জালের কন্যা 'হুর বরাবর' গিল সওয়ারের সঙ্গে হামজার সাক্ষাৎ হলে 'আমির মোস্তান হৈল দেখিয়া তাহাকে' আর শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হতেও দেরী হল না। এরকম ঘটনা আরো ঘটেছে। কেবল আমীর নন, তাঁর সঙ্গীরাও এইরকম প্রথম দর্শনজাত প্রণয়েই অভ্যস্ত। যেমন :

জোপিনের জরু বিবী ছুরত নেগার।
হইল ওম্মর মাদি আসক তাহার ॥

এই 'আসক'তার আর যে কোন গুণ থাক, নিষ্ঠা নেই। অথবা বলা যেতে পারে যে, অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার মোচনের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠাও ধুয়ে মুছে গেছে।

কাব্যের শেষদিকে হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব ঘটেছে। নওশেরওয়ঁা জ্ঞানবৃদ্ধ বুজরচেহ মেহেরের দুই চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন। বুজরচেহ মেহের মক্কা শরীফে এসে চল্লিশ দিনের শিশু মুহম্মদের পদধূলি চোখে মেখে আল্লাহ্‌র কাছে দৃষ্টিশক্তি ফিরে চাইলেন। অমনি

গায়েবি আওয়াজ তারে কহিল এলাই।
করিলে বহুত জারি মাঙ্গিলে থোড়াই ॥
ইহা হৈতে আর কোন মতলব মাঙ্গিতে।
তাহাও পাইতে তুমি নবির বরকতে ॥
এয়ছাই মাঙ্গিতে দোওয়া দস্ত ওঠাইয়া।
দুনিয়ার যত মোরদা দিত জেলাইয়া ॥

কিন্তু যঁার বরকতে পৃথিবীর সকল মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হত, তিনিই কি আল্লাহ্‌র রোষ থেকে মুক্তি পেলেন! কাব্যের শেষভাগে আছে ঃ

রছুল কহেন ভাই কোন বাতে ডর নাই
যদি আসে তামাম জাহান।
যতেক কুফর জোরে একেলা মারিবে তারে
চাচ্চা মেরা আমির পাহালওয়ান ॥…
রছুলের বাত পরে এলাহি বেদেল তারে
কাহে নবি পাসরিল মোরে।
ভুলিয়া আমার তরে চাচ্চার গুমান করে
না জানে কি হইবে আখেরে ॥
আর একবার নবি আপনা দাঁতের খুবি
দেখিয়া করিল তকব্বরি।
নাহি জানে দেল বিচে গুমানেতে গোনা আছে
যেয়ছা কাম তেয়ছাই মজুরি ॥

সম্ভবতঃ রসুলের 'কামে'ই হামজা 'মজুরী' লাভ করলেন শাহাদাৎ বরণ করে —হেন্দিয়ার হাতে তাঁর মৃত্যু হল। হেন্দিয়া অবশ্য অনুতপ্ত হলেন, মুসলমান হলেন—কিন্তু হামজা আর ফিরলেন না, কাব্যও সমাপ্ত হল।

দুইখণ্ড 'আমীর হামজা'য় অঙ্কিত চরিত্রের সংখ্যা এত বেশী যে তার সবকটিকে মনে রাখা সম্ভব নয়। তার উপরে অধিকাংশেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এত কম যে, একটির সঙ্গে অপরটিকে জড়িয়ে ফেলাও অসম্ভব নয়। পার্শ্ব-চরিত্রগুলোর মধ্যে উম্মর উম্মিয়া উল্লেখযোগ্য : কিন্তু তার ভোজবাজির পৌনোপুনিকতা তার বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করেছে।

রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এমন কিছু নয়। কয়েকটি অনুপ্রাস লক্ষণীয় :

১। হামজার গোলাম হামজা কহে বাত।

২। করেন খাতেরদারি বেটির খাতির।

৩। পান্‌জাগির ধরে পানজা আমির হামজার।

পাঁচ

হজরত আলীর ইতিহাসবিখ্যাত শৌর্যবীর্য কাল্পনিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে এবং তাঁর সম্পর্কে নানারকম গল্পগুজব প্রচলিত আছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ফারসী ভাষায় সংকলিত শিয়া ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ আলী আকবর ইবনে আলী আসগর-রচিত 'আকায়দুশ শিয়া'য় উল্লিখিত হয়েছে যে, বিবি ফাতেমার মৃত্যুর পর হজরত আলী আরো বারোজন স্ত্রী গ্রহণ করেন এবং মোট সতেরোটি পুত্র ও উনিশটি কন্যা লাভ করেন।[১] আলীর ঔরসে ও আম্বাজরানী বিবি হনুফার গর্ভে জাত মুহম্মদ ইবনুল হানাফিয়া (অর্থাৎ হানাফী নারীর তনয় মুহম্মদ) পিতার তুল্য বীরত্ব অর্জন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। তাঁকে নিয়েও নানারকম কাল্পনিক উপাখ্যান রচিত হয়েছে ফারসীতে ও উর্দুতে। তার অনুসরণে বাংলায়ও কাব্য রচিত হয়েছে, যেমন, সাবিরিদ খানের 'হানিফা ও কয়রাপরী' (ষোড়শ শতাব্দী) ও মোহাম্মদ খানের 'হানিফার লড়াই'

১। Browne : Literary History of Persia, Vol IV, p 392.

(সপ্তদশ শতাব্দী)।[১] স্ত্রীভাগ্যে হানিফাও সৌভাগ্যবান ছিলেন: তাঁর চার স্ত্রী—মল্লিকা, জৈগুন, সমর্তভান, সোনাভান—অত্যন্ত বলবীর্যের অধিকারিণী হিসেবেই কাব্যে চিত্রিত হয়েছেন। জনপ্রিয় কাব্যের নায়িকারূপে এঁরা বাংলাদেশে সর্বজনপরিচিত।

উর্দুতে নূরউদ্দীন রচিত 'জঙ্গে জয়তুন' বলে একটি কাব্য আছে, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজ্ঞী জয়তুনের সঙ্গে হানাফিয়ার যুদ্ধবর্ণনা।[২] দাক্ষিণাত্যের কবি ফজল বিন মুহম্মদও 'কিস্সা-এ-জায়তুন' বা 'জঙ্গনামা মুহম্মদ হানিফা' বলে কাব্য লেখেন দাকিনী মসনবীতে।[৩] বাংলায় একই বিষয় নিয়ে সৈয়দ হামজা যে কাব্য রচনা করেন, তারই নাম 'জৈগুনের পুথি'। সম্ভবতঃ তিনিও কোন প্রচলিত উর্দু কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন।

এরেমের বাদশাজাদী জৈগুন ছিলেন অসাধারণ বীর্যবতী রমণী। যে ব্যক্তি তাঁকে বলে পরাজিত করবেন, তিনি তাঁরই পাণিগ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। দেশবিদেশের রাজারা তাঁর পাণিপীড়নের আশায় যুদ্ধ করতে এসে কেউবা নিহত হন, কেউবা পরাজিত হয়ে দাসত্ব বরণ করেন। একদিন শিকার করতে এসে হানিফার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও দ্বন্দ্ব ঘটল। প্রথম যুদ্ধে হানিফার পরাজয় ঘটলে তাঁর মাতা হনুফা বিবি যুদ্ধ করতে এলেন জৈগুনের সঙ্গে, কিন্তু তিনিও হার মানলেন। হানিফা আবার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলেন, জয়লাভ করলেন ও জৈগুনের রূপে মোহিত হলেন। জৈগুন মুসলমান

১। মুহম্মদ এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পৃ ১০৮, ১৮৭। হানিফার বীরত্বসংক্রান্ত অন্যান্য কাব্যের উল্লেখ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত 'পুথি পরিচিতি'র ৪১২; ৪১৭, ৪১৯ ও ৪২০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

২। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: পূর্বোক্ত।

৩। আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ: বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান—গুলে বকাওলী। সাহিত্য পত্রিকা, শীত, ১৩৬৪।

হয়ে হানিফার বাগদত্তা হলেন। কিন্তু হানিফার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, এরেম শাহকে মুসলমান না করে তিনি মদিনা ফিরবেন না। এরেমে যাবার পথে এক বাগানে হানিফা বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন: পরীর বাদশা শাহা পরীর কন্যা কুয়াপরী তাঁকে দেখে আসক্ত হল। সেই বাগানের অধিকারী জেন্দাল বাদশাকে পরাজিত ও ইসলামে দীক্ষিত করে হানিফা গেলেন এমরানের দেশে। এমরানের দুই বোনকে বন্দী করে তিনি এমরানকে উদ্ধার করলেন, মুসলমান করলেন ও রাজা করলেন। সেখান থেকে হানিফা এলেন এরেমে।

ওদিকে বিবি হনুফার সঙ্গে জৈগুন মদিনা ফিরছিলেন। পথে তাঁকেও যুদ্ধবিগ্রহ করে জয়যুক্ত হতে হল। শেষে তিনিও এরেমে এলেন—উভয়ের সাক্ষাৎ হল। এরেমরাজের পনেরো লাখ লস্কর, চল্লিশ হাজার হাতী ও অগণিত গরু গাধা উটের সঙ্গে যুদ্ধ করে হানিফা জয়লাভ করছিলেন—কিন্তু শত্রুপক্ষ তাঁকে ফাঁদে ফেলে আহত করল। জৈগুন তাঁকে উদ্ধার করে বললেন:

বিবি বলে তোমার হুকুম যদি পাই।
কাটিয়া বাদশার শির এখানে পৌঁছাই॥

অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে জৈগুন আহত হানিফাকে নিয়ে এলেন এমরানের দেশে। এখানে যুদ্ধ করে এমলাককে হারিয়ে দিলেন তিনি, 'এমলাক জানের ডরে আনিল ইমান'। এমরানের প্রাসাদ থেকে কুয়াপরী বীর হানিফাকে চুরি করে নিয়ে পালাল। হানিফার সন্ধান না পেয়ে জৈগুন ফিরে এলেন মদিনায়। শেষে হজরত মুহম্মদের (দঃ) রওজা শরীফ থেকে হানিফার অবস্থান জানিয়ে সেখানে জৈগুনকে পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হল। জৈগুন 'হানিফা' নাম ধারণ করে উম্মর উম্মিয়া ও জোবেদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রথমে মিয়াদ বাদশার সঙ্গে, তারপর দোমরাজ বাদশার সঙ্গে, তারপর কোমর বাদশার সঙ্গে, শেষে মনুষ্যখাদক সাত ভাই আদির সঙ্গে যুদ্ধ করে ও তাদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে জৈগুন পৌঁছলেন পরীস্থানে। বিবরণ শুনে শাহা পরী কন্যাকে বন্দী করলেন এবং হানিফা-জৈগুনে মিলন ঘটালেন

সাত বৎসর পর। তাঁরা এক ঘরে পবিত্র হয়ে বাস করলেন। তারপর পরীদের চিকিৎসায় হানিফা নিরাময় হলেন। অনেক ভেট নিয়ে তাঁরা ফিরলেন পরীস্থান থেকে।

চোদ্দ বছর পর হানিফা এরেমে লড়তে এলেন। এরেমের বাদশা কৌশলে আক্রমণ করে হানিফাকে আহত করলেন। এরেম জৈগুনকে ধরতে আদেশ দিলেন : 'জাত মজাইল মেরা তুরুকে মিলিয়া'। জৈগুন বন্দী হলেন—হানিফা পর্বতগাত্রে আশ্রয় নিলেন। আল্লাহ্‌র আদেশে বাতাস এই খবর পৌঁছাল হজরত আলীর কাছে। আলী এলেন এরেমে, এরেমরাজ শুনলেন তাঁর পরিচয় :

দেউল দোহারা তুড়ে কৈল ছারখার।
না রাখিল আমল হিন্দুর দেবতার॥

আলী এরেমকে পরাজিত করে সকলকে উদ্ধার করলেন। এরেম গেলেন তাঁর ভাই ফালাতুনের আশ্রয়ে। ফালাতুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে জৈগুন তাঁকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন :

খাইলে হালাল চিজ খুব মজা পাবে।

ফালাতুন অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু 'হালাল চিজে'র লোভে নয়, যুদ্ধে হেরে গিয়ে প্রাণের ভয়ে। একে একে সব ভাইয়েরই এই দশা হল। কেবল কহতিয়া দর্প করে বললেন :

কহতিয়া কহিল কাহে কলেমা পড়িব।
লাত মনাতের পূজা কাহেক ছাড়িব॥
জান যায় সেও ভাল জাত দিব কাহে।
যাহা জান তাহা কর জীউ যাহা চাহে॥

জৈগুনের হাতে তাঁর মৃত্যু হল। গোরাব বাদশা 'সেহবি জানের ডরে কলেমা কবুল করে'। 'না লড়িব জাত দিয়া বাঁচাইব জান' ভেবে এমলাক সসৈন্যে মুসলমান হলেন। কহতবুর ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। মঞ্জীর শাহা ও এরেম মুসলমান হলেন। তবে এরেমের একটি শর্ত ছিল :

সবার বাদশাই মুঝে দিয়া যদি রাখ কাছে
তবে আমি হই মুসলমান।
তোমার হুকুম রাখি গোলাম হইয়া থাকি
নহেত হাজির আছে জান ॥

আলী এ শর্ত মেনে নিলেন। তাই এরপর তিনি যখন হানিফা-জৈগুনের বিবাহের প্রস্তাব করলেন, এরেম তখন সানন্দে সম্মতি দিলেন। সবাই মদিনায় ফিরে এলেন। হানিফা-জৈগুনের পরিণয় ঘটল, কিন্তু কবি তার বিবরণ দিলেন না, কেননা ঃ

কমি বেশী হয় যদি সহজে ঘটিবে বদি
লিখি যদি কিছু বেহেজার।
খারাব হইয়া যাব দুনিয়াতে দুঃখ পাব
আকবতে হইবে আজার ॥
এ খাতেরে হানিফার সাদীর বয়ান আর
না লিখিনু আদব রাখিয়া।
করিনু যতেক সেখি তাহার দৈসত রাখি
না জানি কি ফলে আমা দিয়া ॥

এই কাব্যের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের পরাক্রমের কাছে অনৈসলামিক শক্তির পরাজয়বর্ণন। ইসলামপ্রচারের যে পদ্ধতি এখানে কবি দেখিয়াছেন, তা সম্পূর্ণতই তরবারির সাহায্যে—ধর্মমতের মাধুর্য বা ঔদার্যের জন্যে নয়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে এই কেন্দ্রীভূত আবেগকেই কবি প্রকাশ করেছেন—চরিত্রসৃষ্টি বা কবিত্বপ্রকাশের সুযোগ নেন নি। কোন অমুসলমান চরিত্র যখন বাহুবলে পরাজিত হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছেন, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি যে কেবল ইসলামের অকৃত্রিম অনুরাগীরূপে আত্মপ্রকাশ করছেন, তা নয়—এক নিমেষেই পূর্বের ধর্মমতের প্রতি তাঁর সীমাহীন বিদ্বেষ ও সেই ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতাবোধও প্রকাশিত হচ্ছে। নতুন ধর্মের প্রতি ভক্তির

আতিশয্য তাঁর আর সকল চেতনাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলছে। উদাহরণস্বরূপ নও-মুসলমান জৈগুন কর্তৃক পিতৃহননের প্রস্তাব স্মরণ করা যেতে পারে। এখানে তাঁর দ্বিধাহীনচিত্ততা যে নীতিবোধের পরিচয় দেয়, তা ইসলাম ধর্মলব্ধ বলতে সকলেরই কুণ্ঠা জাগবে। এ এক ধরণের অন্ধ আবেগ মাত্র, কিন্তু কবি একেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এই গ্রন্থের উম্মর উম্মিয়া চরিত্রটি প্রথমে দেখা গিয়েছিল গরীবুল্লাহ্-হামজার 'আমীর হামজা'য়। এখানে তিনি আবার দেখা দিয়েছেন—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ যাদুকরী বিদ্যা নিয়ে। আমীর হামজার সঙ্গে হানিফার কালগত ব্যবধান কবির কাছে হয়তো প্রতীয়মান হয় নি—তাই উম্মর উম্মিয়া উভয়েরই সমকালীন বলে প্রতিভাত হয়েছেন। কালের চেয়ে কীর্তিই কবির কাছে বড়ঃ সেদিক দিয়ে হামজা ও হানিফায় তেমন ভেদ নেই। সুতরাং হামজার সঙ্গী উম্মর উম্মিয়া কিংবা তাঁরই নাম ও সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অপর কেউ হানিফারও সঙ্গী হতে পারেন। এঁর সম্পর্কে এরেম শাহের উক্তি—"ভোজকে জিনিয়া বাজীকর"—প্রণিধানযোগ্য।[১]

এই কাব্যের চরিত্রের সঙ্গে তাঁর অন্য কাব্যের চরিত্রের যেমন মিল আছে, তেমনি মিল আছে যুদ্ধবিগ্রহের। তাই যুদ্ধের বর্ণনায় যেসব উপমা দেওয়া হয়েছে, যেমনঃ

১। লস্করে লস্করে যদি হইল মোকাবেলা।
ময়দানে পড়িল যেন চৌগানের খেলা॥
২। কাটিয়া চলিল যেন কলার বাগান।
৩। বাঘ যেন সান্ধাইল ছাগলের পালে।
৪। বাজের ঝাপট যেয়ছা শিকার উপর।
৫। ডানদিকে তলওার বাম হাতে ঢাল॥
কুমারের চাক যেয়ছা ঘোরে চারিদিকে।

১। উম্মর উম্মিয়ার ভোজবাজি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারেও প্রচলিত আছে।

এর মধ্যে প্রথমটি সুন্দর, আর সবই গতানুগতিক। আলীর হাঁক কেমন? না,

হাঁকিল হায়দরি হাঁক আলি পাহালওান।
কাফেরে বুঝিল দেলে ভাঙ্গিল আছমান ॥
পাহালওার্ন লোকের হাওয়া গেল উড়ে।
হামেলা আওরতের হামেল গেল পড়ে ॥

এই যুদ্ধং দেহি মনোভাবই এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। কবির কাব্যের মূল যাই হোক না কেন, বাংলায় একে রূপান্তরিত করার সময়ে কবি তাঁর সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সুতরাং এ কাব্যের অমুসলমান চরিত্রগুলি যে তাঁরই প্রতিবেশী রামশ্যামের রূপ নিয়ে দেখা দেবেন, তাতে আর বিচিত্র কি! তাই দোমরাজকে উম্মর উম্মিয়া যখন বলছেন :

দেও পূজা ক্ষমা দেহ ঝুটি মালা ছাড়।
একভাবে নবীর কলেমা মুখে পড় ॥
কাঁধে রশি ছেরে ঝুটি গলে রাখ মালা।
হিন্দু বলাইতে কেন কর এত জ্বালা ॥
আমার নবীর দিনে কোন লেঠা নাই।
সব ছাড়ি দাড়ি রাখ শুন মেরা ভাই ॥

তখন তা অশিক্ষিত গ্রামবাসীর উক্তি বলেই মনে হয়।

তেমনি শাহা পরী যখন তাঁর কন্যার নির্লজ্জতাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন :

অকুমারি বেটি যার করে এয়ছা কারবার
দেশে তার কিসের ভরম।

তখন মধুমালতীর মাতা রূপমঞ্জরীর কথার প্রতিধ্বনি শুনে আমরা বিস্মিত হই নে—তখন তাঁকে কবির সমকালীন সমাজেরই প্রতিনিধি বলে মনে হয়, যেখানে নারীর প্রণয়াধিকার স্বীকৃত হয় নি।

আর জেন্দাল বাদশাহকে প্রদত্ত হানিফার উপদেশের কথাও বল্‌তে হয়ঃ

শরা আদালত কাম রাখিবে বাহাল।
রায়েতের এনছাফ করিবে হামেহাল ॥
গরীব কাঙ্গাল লোকে করিবে মেহের ।
রওয়া না রাখিবে বাত জালেম লোকের ॥
না করিবে জুলুম রায়েত লোক পর ।
নছিহত এয়ছাই করিল বহুতর ॥

এখানে কি বর্তমানের অরাজক অবস্থার অবসান কামনা করে, এই উপদেশ যিনি বাস্তবে প্রয়োগ করবেন, কবি তাঁর পদধ্বনি শুনতে চেয়েছিলেন ?

ছয়

হাতিম আল তাই ছিলেন প্রাক-ইসলাম আরবের একজন বিশিষ্ট বীরযোদ্ধা ও কবি। ষষ্ঠ শতকের শেষার্ধে তাঁর জন্ম, সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দানধ্যান, অতিথিসেবা ও উদারতার পরিচয় দিয়ে তিনি দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন ঃ পরের সেবা করতে যেয়ে তিনি নিজের সুখসুবিধার দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাঁর এই পরোপকারপ্রবৃত্তি নিয়ে আরবে নানা জনপ্রিয় আখ্যান প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর কাহিনী নিয়ে পারস্যে 'কিস্‌সা-ই-হাতিম তাই' ও 'হফ্‌ত ইনসাফ-ই-হাতিম তাই' নামে জনপ্রিয় রোমান্স রচিত[১] হয়। এইসব কাব্যের মধ্যে হুসেন ওয়াইজ-ই-কাশিফীর (মৃত্যু ১৫০৪-৫খৃঃ) লেখা 'কিস্‌সা উ আসার-ই-হাতিম তাই' ('রিসালা-ই-হাতি-মিয়া') বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তুর্কী ভাষাতেও 'দাস্তান-ই-হাতিম তাই' নামে কাব্য রচনা হয়েছে। উর্দুতে এই কাহিনী রূপ পেয়েছে 'কিসসা-ই-হাতিম তাই' ও 'আরায়েশ মাহফিল' নামের কাব্যে।[১]

সৈয়দ হামজার 'হাতেম তাই' উর্দু 'আরায়েশ মাহফিল' কাব্যেরই অনুবাদ ঃ প্রচলিত বাজার সংস্করণের প্রচ্ছদে 'তরজমা আরায়েশ মাহফেল' লেখা

১। Houtsma and others ed : Encyclopaedia of Islam, Vol II, p 290.

আছে। হামজার আগে এই কাহিনী নিয়ে বাংলায় কোন কাব্য রচিত হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে জোর করে বলা যায় না। শাহাদাৎউল্লাহ্ (ছাদতুল্লা) নামে এক কবির লেখা 'হাতেম তাই' (মিশ্ররীতির কাব্য নয়) কাব্যের পাণ্ডুলিপি থেকে কেউ কেউ এর রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলে মনে করেন।[১] নির্দিষ্ট রচনাকালের অভাবে একে আমরা হামজার গ্রন্থের পূর্ববর্তী বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। অনতিবিলম্বে মিশ্র ভাষারীতির আরেকজন কবি—মোহাম্মদ দানেশ—হামজাকে অনুসরণ করেছিলেন 'হাতেম তাই' কাব্য রচনা করে। এই উপাখ্যানের বাংলা গদ্যরূপ উনিশ শতকে বেশ প্রচলিত হয়েছিল।

সওদাগরজাদী হুসনাবানুর রূপমুগ্ধ মনীর শামীর বাসনাপূর্তির জন্যে সাতটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে হাতেম তাইয়ের অভিযান এই কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয়। নিঃস্বার্থ হাতেম যাত্রা করেছেন দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে: পথে আবার কারো অতৃপ্ত কামনা তাঁর হৃদয়ে বেদনা জাগ্রত করেছে। তখন তিনি মূল অনুসন্ধানকার্য স্থগিত রেখে আবার কখনো দুরূহ তিন প্রশ্নের জবাব এনে প্রেমিককে শান্ত করেছেন, কখনো দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করে তার পুরস্কারস্বরূপ কোন প্রেমিকের সঙ্গে তার ইপ্সিত নারীর মিলনসাধনের অধিকার লাভ করেছেন। তিনি নিজেও বিবাহ করেছেন একাধিকবার, তাদের মধ্যে কেউবা ভালুকের কন্যা, কেউবা পরী। তাঁর অভিযান যেমন দেশকালের সীমা পেরিয়ে, তেমনি বাস্তবের গণ্ডী অতিক্রম করে। তাঁব যাত্রাপথে দৈত্যেরা পাহারা দেয়, পরীরা নৃত্যগীত করে, পশুপক্ষী কথা বলে। সাপের পেটে হাতেম অক্ষত থাকেন, কুমীরের পেট থেকে বেরিয়ে আসেন নিরাপদে, অবলীলাক্রমে

১। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: পুথি-পরিচিতি, পৃ ৬৩৪-৫।

পরাজিত করেন বিরাটাকার দৈত্যকে। পরীরাজ তাঁকে পুরস্কৃত করেন, মৃত্যুদূত তাঁর পাঁচ হাজার বছর আয়ুর কথা সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করেন, মৃত ব্যক্তি রূপ ধারণ করে কথা বলেন তাঁর সঙ্গে। বাস্তবের সঙ্গে এই কাব্যের যোগ নেই বললেই চলে—এ যেন বড়দের রূপকথা।

কবি অবশ্য এ কাহিনীকে ইতিহাসের সগোত্র মনে করেছেন। তাই তিনি আক্ষেপ করছেন ঃ

হামজা বলে এই বাতে আফছোছ হাজার।
এয়ছা মর্দ্দ কেন না হইল দীনদার ॥

আবার, হামজা বলে হাতেম হইলে দীনদার।
পয়গাম্বরি দর্জ্জা দিত পরওয়ার দেগার ॥

এ সত্ত্বেও অমুসলমান হাতেমের আত্মত্যাগস্বীকারের ও নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের কাহিনী তিনি যেমন সাগ্রহে ও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, হাতেমও তেমনি বারবার আল্লাহ্‌র কাছে 'শোকরানা' আদায় করেছেন।

এই আগ্রহ সত্ত্বেও 'হাতেম তাই'তে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের নমুনা নেই। তার একটি কারণ বোধহয় কবির বার্ধক্য। কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ সম্ভবত প্রথানুগত্য। তাছাড়া, কাব্যে যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেখানে যেমন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তেমনি তার প্রকাশভঙ্গীতে কোন পার্থক্য হয়নি বলে কাব্য হয়েছে একঘেঁয়ে। কোন তরুণ বা বৃদ্ধ যখনই কোন মানবী বা পরীকে দেখেছেন, সেই মুহূর্তেই তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটেছে। সেই রমণীরা আবার একে অন্যের অনুরূপ, কেননা তাঁদের সকলেরই পূর্ণিমার চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, মদনবাণতুল্য মৃগনয়ন, ধনুকের মতো ভ্রূ ও সিংহকেশরপ্রায় আজানুলম্বিত কেশ দেখা যায়। এরকম অপরূপ সুন্দরী নারীর দর্শনমাত্রই

কাব্যোক্ত পাত্রেরা যেমন প্রণয়োন্মাদ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, তেমনি তাঁদেরকে লাভ করতে পারলে সকলের একটি ভাবই জাগ্রত হয়, কবির ভাষায় তা হল, 'কাঙ্গাল পাইল যেন মালের সিন্দুক'। এই কাব্যে হাতেমের প্রধানতম কর্তব্য হচ্ছে, এহেন প্রেমকাঙ্গালদেরকে অনুরূপ সৌন্দর্য-পেটিকা লাভ করিয়ে দেওয়া।

এই প্রণয়াবেগের আতিশয্য অধিকাংশই পুরুষ চরিত্রের উপর অর্পিত হয়েছে। তুলনায়, নায়িকারা অনেকখানি নির্বিকার। অবশ্য পরীকন্যা যে হাতেমের রূপে আকৃষ্ট হয়ে সদলবলে তাঁকে অপহরণ করেন নি, এমন নয়ঃ তবে তেমন ঘটনার বাহুল্য নেই। বরঞ্চ, এমন নারীর সংখ্যাই বেশী, নায়কদের দুঃখকষ্টে যাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হয় নি,—সাত প্রশ্ন বা তিন জিজ্ঞাসার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন পরীক্ষার্থীর কণ্ঠেই নির্বিচারে বরমাল্য দান করতে তাঁরা প্রস্তুত।

এ কাব্যে লৌকিক পৃথিবীর সঙ্গে অতিলৌকিক জগতের সীমারেখা টানা হয় নি। তাই মানুষে-পরীতে প্রেম এবং মানুষে-দৈত্যে সংঘর্ষ এখানে লেগেই আছেঃ একে অবলীলাক্রমে অন্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব দিকটাই উপেক্ষিত হয়েছে, পরী-দৈত্য-পশুপক্ষীর চরিত্রে মানবীয় ভাবাদর্শের ছায়াপাত ঘটে নি। মঙ্গলকাব্যের তুলনায় মিশ্র ভাষারীতির কাব্যের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানেই। 'চণ্ডীমঙ্গলে' শিব-পার্বতীর জীবনযাত্রার মধ্যে সেযুগের বাঙালী সংসারের ছায়াপাত ঘটেছেঃ কালকেতুর পরাক্রমে পীড়িত বন্য পশুরা দেবীর কাছে যে কাতর আবেদন জানিয়েছে, তার মধ্যেও সেকালের নিম্নবিত্ত সমাজের একটি সকরুণ অভিযোগ ধ্বনিত হয়েছে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আমরা মানুষের অস্বাভাবিক,

ও অলৌকিক বিক্রম দেখে বিস্মিত হই বটে, কিন্তু সে মানুষকে আপনজন বলে গ্রহণ করি নে : তাকে জিন পরীর সগোত্র বলেই মনে করি।

সাত

মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে শৃঙ্গার, বীর আর ভয়ানক রসেরই প্রাধান্য দেখা যায়। রস যাই হোক না কেন, সাধারণ ও স্বাভাবিক মানুষের জীবনে বা চরিত্রে এই রসের স্ফূর্তি যে রূপ লাভ করতে পারত, এখানে তার রূপায়ণ হয়েছে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে। তার একটি কারণ এই যে, এই কাব্যধারায় যে জগত সৃষ্টি হয়েছে, তা ঠিক প্রাকৃত জগত নয়, একে বরঞ্চ আধিদৈবিক বলা যেতে পারে।

আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রাকে এড়িয়ে এই কাব্যধারার রচয়িতারা এমন অলৌকিক জগতে আশ্রয় নিলেন কেন, এ প্রশ্ন তাই যে কোন সচেতন পাঠকের মনেই জেগে উঠবে। এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটলেই মানুষ শক্তিমানের কল্পনা করে নিজের সহায় হিসেবে ; ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন অনেকেই দেখে থাকেন। কবির সমকালীন জীবনযাত্রা যে নানাদিক দিয়ে ব্যাহত হয়েছিল, এতে সন্দেহ নেই। সেদিনের বাস্তব তুচ্ছতা ঢাকতেই হয়তো কল্পনার ঐশ্বর্য আমদানী করতে হয়েছিল।

কিন্তু কল্পনার ঐশ্বর্যই বা একে বলি কি করে! এই কল্পনার পেছনে তো সুস্থ ও শিক্ষিত মনের অনুভূতি নেই—আছে অন্ধ সংস্কার আর ভ্রান্ত বিশ্বাস।

কাজী আবদুল ওদুদের মূল্যবান উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : 'দৈববলে বিশ্বাসমাত্রই সাহিত্যে বা জীবনে দোষাই নয়, কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে

যখন যোগ ঘটে অজ্ঞানের ও ভয়বিহ্বলতার, তখন তা হয়ে ওঠে জীবনের জন্য অভিশাপ—সাহিত্যেও একান্ত অবাঞ্ছিত।"[১] মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে এই ব্যাপারটি ঘটেছে; তাই কবি যখন মনে করেছেন যে, তিনি ধর্মের মাহাত্ম্যগান করছেন, তখন তাঁর রচনায় ইসলামের শিক্ষা, নীতি ও ইতিহাস হয়েছে চরমভাবে বিকৃত; পাঠকের সামনে আদর্শ জীবনকে তুলে ধরতে চেয়ে তিনি যে জীবনধারাকে আশ্রয় করেছেন, তা 'মরীচিকার মতো মিথ্যা ও বুদ্বুদের মতো শূন্য'।

মানুষের স্বাভাবিক শক্তিতে কবির অবিশ্বাস ও পরিচিত জগতে কাব্যবস্তুর সন্ধানলাভে তাঁর অক্ষমতায় তাই আমরা দুঃখিত না হয়ে পারি নে। বাস্তব পরিপার্শ্বের ছায়াপাত এসব কাব্যে ঘটেছে, তা আমরা জানি। সে প্রতিচ্ছায়ার একদিকে স্বাধীন প্রণয় সম্পর্কে সমাজের আপত্তি, অন্যদিকে, পরধর্মের প্রতি কবির অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীন প্রণয় শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে সমাজের ওপরে, এটা আনন্দের কথা। কিন্তু কবির বৃহত্তর মানবীয় চেতনা যে তাঁর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কাছে পরাজিত হয়েছে, সেটা তেমনি দুঃখের বিষয়।

তর্ক তোলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক রচনার কি অভাব ছিল? ছিল না হয়তো। কিন্তু তার মধ্যে যা কিছু মহৎ রচনা বলে স্বীকৃত, তা বৃহত্তর মানবরসে (human interest) সিঞ্চিত—যার ফলে সাধারণ মানুষের হৃৎস্পন্দন সেখানে ধ্বনিত না হয়ে পারে নি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কাব্যসমূহে তার অভাবই সবচেয়ে বড় করে

১। 'বিষাদ সিন্ধু': শাশ্বত বঙ্গ, পৃ ১২৪।

চোখে পড়ে। তাই এর আবেদন খুব ব্যাপক হতে পারে না।

মিশ্র ভাষারীতির কাব্য মহৎ সাহিত্য বলে স্বীকৃতি পায় নি আরো এক কারণে। চিন্তার মতো রচনাভঙ্গীর দৈন্যও এই ধারার কাব্যে সুস্পষ্ট। এর প্রধানতম হেতু বোধহয় কবিদের শিক্ষার অভাব।

এই কাব্যধারা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল তাই এর সাহিত্যমূল্যের জন্যে নয়, বরঞ্চ এর ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যেই। একজন অল্পশিক্ষিত অনুবাদক হিসেবেই সৈয়দ হামজাকে আমরা গ্রহণ করব। তাঁর তুলনায় গরীবুল্লাহ্ কবি হিসেবে বড়, কিন্তু পরবর্তী রচয়িতাদের তুলনায় সৈয়দ হামজার কবিকর্ম বেশী উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাঁব 'মধুমালতী' স্মরণীয় রচনা—অমিশ্র ভাষারীতির জন্যে তো বটেই, রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের পরিমাপেও তা খাটো নয়।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, গরীবুল্লাহ্‌রও শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর প্রণয়কাব্য 'ইউসুফ জেলেখা'। মনে হয়, উভয় কবিরই স্বাভাবিক প্রতিভা এই জাতীয় কাব্যরচনারই অনুকূল ছিল। কিন্তু সমসাময়িককালের ফারসী যুদ্ধকাহিনী-কাব্যের জনপ্রিয়তায় বিভ্রান্ত হয়ে এঁরা জঙ্গনামাশ্রেণীর কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। তাঁদের শ্রোতারাও বোধহয় এতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মুহূর্তের জন্যে কবিরা তাঁদের নিরুত্তাপ ও বৈচিত্র্যহীন জীবনে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন, তাঁদের মূঢ় কল্পনার খোরাক জুগিয়েছিলেন। সেই বিশেষ মুহূর্তের, বিশেষ পরিমণ্ডলের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই কবিদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। কেবল যেখানে চিরন্তন সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাঁদের সেই প্রণয়কাব্যই হয়তো কালের আঘাত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

বইতে মুদ্রিত লেখকের নামানুযায়ী

ক. মূলগ্রন্থ

১। আবদুর রহিম : প্রেমলীলা। গৌড়ীয় যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৬৮।

২। ওয়াজেদ আলী : সত্যপীরের পুঁথি—মদন কামদেবের পালা। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

৩। মালে মোহাম্মদ : ছয়ফলমুল্লুক বদিওজ্জামাল। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

*৪। সাহা গরীবুল্লা ও ছৈয়দ হামজা : বড় আমির হামজা। গাওছিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৬।

*৫। ছৈয়দ হামজা : কেচ্ছা মধুমালতী। রেয়াজিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৩০১।

৬। ছৈয়দ হামজা : জৈগুনের পুঁথি। ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৫।

৭। ছৈয়দ হামজা : লালমোন। তাজমহল বুক ডিপো, কলিকাতা, ১৩৫৯।

৮। ছৈয়দ হামজা : সোনাভান। সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৬।

৯। সৈয়দ হামজা : হাতেম তাই। হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫।

খ. সমালোচনা ও ইতিহাস

১০। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত : পুথি-পরিচিতি। বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

১১। কাজী আবদুল ওদুদ : শাশ্বত বঙ্গ। কলিকাতা, ১৩৫৮।

১২। গোপাল হালদার : বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড। এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬১।

১৩। পাকিস্তান পাবলিকেশনস্ প্রকাশিত : বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য। ঢাকা, ১৯৫৫।

১৪। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।

---

* অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৌজন্যে।

১৫। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৫৭।

১৬। ডক্টর সুকুমার সেন : ইসলামি বাংলা সাহিত্য। সাহিত্য সভা, বর্ধমান, ১৩৫৮।

১৭। ডক্টর সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৪৮।

১৮। Blumhardt, J. F. : Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India Office. Oxford University Press, London, 1924.

১৯। Blumhardt, J. F. : Catalogue of Bengali Printed Books in the Library of the British Museum. London, 1865.

২০। Browne, E. G. : A Literary History of Persia, 4 vols. University Press, Cambridge, 1956 edn.

২১। Houtsma, M. Th., Wensinck, A. J., Arnold, T. W., Heffening, W., and Levi-Provencal, E. ed. : The Encyclopaedia of Islam, vol II. Leyden & London, 1927.

২২। Long, J. : A Catalogue of Bengali Works. Calcutta, 1855.

২৩। Rieu, Charles : Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, Vol II. London, 1881.

গ. সাময়িকপত্র

২৪। আল এসলাম। কলিকাতা, ১৩২৩।

২৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী। ঢাকা, ১৩৬১।

২৬। দিলরুবা। ঢাকা, ১৩৬৩।

২৭। ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী। ঢাকা, ১৩৬২।

২৮। র-সা-প-প = রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। রঙ্গপুর, ১৩১৮।

২৯। সা-প-প = সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। কলিকাতা, ১৩০৩।

৩০। সাহিত্য পত্রিকা। ঢাকা, ১৩৬৫।

৩১। JASB = Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta, 1910.